পত্রপত্রিকায় বিনয় মজুমদার

প্রভাত কুমার দাস

বিনয় মজুমদার তাঁর 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক রচনায় নিজের কাব্যচর্চার আদিপর্বের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন : 'এক পালোয়ান বাজি ধরে একটি চলন্ত মোটর গাড়িকে টেনে পিছিয়ে নিয়ে এল'—তাঁর কৈশোরে সর্বপ্রথম কাব্যপ্রয়াসের বিষয় নির্বাচনের এই ছিল প্রাচীনতম স্মৃতি। আবার পরবর্তীকালে বাংলা কাব্য জগতের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন : 'সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি।' সেদিক থেকে, বিনয়-এর কবি-জীবন ও তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত পাঠক হয়ত স্বীকার করবেন, বিনয়-এর কবিতা তাঁর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার এক দীপ্যমান উৎসব, সময়ের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধের এক অবিরল পরাজয়ের কথা-কাব্য। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক বাংলা কাব্যচর্চায় শেষ-পঞ্চাশ থেকে পরবর্তী ষাটের সময়সীমায়, নতুন রীতির নতুন ভাবনার, নতুন উন্মাদনার যে কাব্যপ্রবাহ, সেখানে প্রথমাবধি বিনয়-এর আবির্ভাব ও উপস্থিতি কিছুটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা। যেন সর্বগ্রাসী আস্ফালন আর উন্মাদনার বিপরীত-প্রান্তে একটা প্রশান্ত তন্ময়তার সহজ বাতাবরণে, আমাদের নৈমিত্তিক জীবনপ্রবাহের যে নিশ্চল নৈঃশব্দের কথাহীন মুহূর্ত, তারই সরল বাক্‌ময় স্বচ্ছন্দ প্রকাশ তাঁর কাব্য-চিন্তাকে নতুন রূপ দিয়েছিল। এক অর্থে পঞ্চাশের বাংলা কবিতার যে নতুনতম উত্তাপ, বিনয়-এর কবিতা সেই সময়-সমীপবর্তী, কিন্তু সূচনাকাল থেকেই ব্যতিক্রমী। বিনয় মজুমদার শৈশবে স্বাস্থ্যবান ছিলেন কিনা, কিংবা কুস্তিবিদ্যায় ছিলেন পারঙ্গম, অথবা বাজি ধরে কোনো কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সেসব জিজ্ঞাসা অবান্তর। এমনকি উপর্যুক্ত স্মৃতির উল্লেখ এক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলেও, এরকম একটা ভাবনায় রঙ লাগাতে সাধ হয় : তথাকথিত নতুন কবিসঙ্ঘের শরীরী কবিতার প্রাঙ্গণে বিনয়-এর অকস্মাৎ আবির্ভাব যেন যথার্থই বীরের বেশে, অনেকটা 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' ভঙ্গিতেই।

১৯৪৭ সালে মাত্র তের বছর বয়সে ফরিদপুর মহকুমা শহরে গোপালগঞ্জের কাছে বৌলতলী বিদ্যালয়ের ছাত্র-পত্রিকায় বিনয়-এর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়, পরবর্তী বর্ষে একই বিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে আরো একটি। এই আত্মপ্রকাশের পর থেকেই তিনি কাব্যচর্চায় মাঝে-মাঝেই বিরত হয়েছেন কিন্তু একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি। বিদ্যার্জনের কারণে কলকাতায় এসে মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তালতলা এলাকায় বাস করার সময়, প্রথম বিষ্ণু দের 'চোরাবালি' পাঠ করেন এবং কাব্যানুরাগের কারণে সুকান্ত, সত্যেন দত্ত আর নজরুলের কাব্যগ্রন্থ কিনে ফেলেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়, বই কেনার সূত্রে সিগনেট বুক শপ-এর প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার গুপ্তর

বক্তৃতা শুনে কল্লোল যুগের কবিগোষ্ঠী বিষয়ে অবহিত হন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের কিছু বইপত্র কিনেও ফেললেন, অথচ সে বইগুলি তাঁর মনে কোনো সাড়া জাগালো না। এর পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এসসি. শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসাবে বাস করেন। ততদিনে নিজেই বন্ধুবান্ধবদের অগোচরে নিয়মিত কবিতা লেখা শুরু করেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুমহলে তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রচারিত হয়; কিছুটা তাঁদের প্ররোচনায় ছাত্রাবাসের রন্ধনশালার দেয়ালে নোটিশবোর্ডে সরাসরি নিজের হস্তাক্ষরে স্বরচিত কবিতা সেঁটে দিতেন, যদিও সেসব কবিতা নিছকই ছাত্রাবাসের দৈনন্দিন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা, 'ডালে কেন ডাল প্রায় থাকে না, কেবল জল, মাংস কেন ঘন ঘন খেতে দেওয়া হয় না'—এইরকম ছিল সেসব কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু নিজের কাব্যরচনার অন্যতর উদাহরণগুলি বন্ধুদের কাছে গোপন রাখতেন। 'সৃষ্টির পূর্বাহ্নে, দ্যাখো, নিজেকেই সৃষ্ট করা প্রয়োজন হয়।'—এই বোধে তিনি প্রথমাবধিই সচেতন যে জন্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের সুদৃশ্য দেয়াল পত্রিকায় কিংবা মুদ্রিত বার্ষিক সংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পায়নি। এই সময়, জনৈক সহপাঠী বন্ধুর সাহচর্যে প্রথম 'এক পুরোদস্তুর কবি' বিমল চন্দ্র ঘোষ-এর সঙ্গে আলাপ হল, পরে তাঁর আগ্রহে 'বারোমাস' পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে।

'কবিতা জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে। কলকাতার আর কোনো কবির জীবনে হয়েছে কিনা জানি না।'—বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটি তাঁর কাব্য জীবনে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৭ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী নিয়ে পরবর্তী বর্ষে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন'-এ তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময়, কলেজের বার্ষিক সাহিত্য-সংকলনে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কিছুটা পড়াশুনার চাপে, কিছুটা বিষয়বস্তুর অভাবে, পুরো-দস্তুর কাব্যচর্চায় মনোযোগী হতে পারেননি। একটি 'স্মৃতিকথা' শীর্ষক রচনায় বিনয় তাঁর কাব্যচর্চার এই পর্বের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত কিছু কবিতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন। যৌবন বয়সের সেই সব রচনার পটভূমির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'সেই প্রথম যৌবন আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তেমনি ফিরে আসে না এই প্রকারের কবিতা রচনার মেজাজ। এই গদ্য ঘেষা পৃথিবীতে গদ্যময় জীবন যাপন করতে কবিতাও আমার গদ্য ঘেষা হয়ে গেছে। জীবন সুতরাং কবিতাও গদ্য ঘেষা হয়ে যাবে—এ কথা টের পেয়েছিলাম বছর তিনেক পরে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে।' শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সময় কলেজের গদ্যময় জীবনে, সব ছেড়ে কবি হবেন একথা ভাবেননি তখনও—ইঞ্জিনিয়ার হবেন এই ছিল ইচ্ছা। তবু 'কাপড়ে বাঁধানো রয়াল সাইজের প্রকাণ্ড ডাইরি'তে পাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ রচনার পাশাপাশি অন্তত পঞ্চাশটির মতো কবিতা সে সময় লিখেছিলেন। তখনো পর্যন্ত

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যমণ্ডল ছাড়া বাইরের কাব্যজগতে তাঁর কোনো যোগাযোগ সাধিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে নিজের রচনার ক্রম-অগ্রসরমান পরিণতির ভিতর দিয়েই তাঁর কবিসত্তার বিকাশ ঘটেছে। কাব্য-জীবনের সূচনাতে কোনো দক্ষ সম্পাদকের সান্নিধ্য কিংবা অগ্রজ কবির গভীর পরামর্শ পাননি। এদিক থেকে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটল—১৯৫৯ সালে 'নক্ষত্রের আলোয়' নামের একটি কাব্যপুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মারক-পত্রিকার মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক, অধুনালুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশনের প্রকাশক দেবকুমার বসুর সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল, পরে কবিবন্ধু কুশল মিত্রর মাধ্যমে দেবকুমার-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইতিপূর্বে মনে হয়েছিল, এ পর্যন্ত তিনি যা লিখেছেন, তাতে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে সুতরাং এখন তিনি উদ্যোগ নিতে পারেন। গ্রন্থজগতের দেবকুমার বসুর পরামর্শ ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর প্রচ্ছদ সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত গ্রন্থটি, পরিচিত লেখক-পরিমণ্ডলে যথারীতি বিতরিত হয়েও কোনো আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়নি। বরং রুশ ভাষার অনুবাদ সূত্রে তিনি কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যেটা তার সে সময়ের জীবিকার প্রয়োজনেও সাহায্যকারী হয়েছিল, অন্তত পাঁচটি গ্রন্থ তিনি রুশ থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, 'দিগদর্শন' নামে একটি পত্রিকার আগ্রহে তাঁর বেশ কিছু গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এক বন্ধুর মাধ্যমে। মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে নিজের কবিতার খাতা রেখে আসতেন। মূলত বিষ্ণু দের আগ্রহেই ১৯৫৮ সালে 'সাহিত্য পত্রে' তাঁর 'পাখি' কবিতা প্রকাশিত হয়, সম্ভবত সামগ্রিকপত্রের পাতায় এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশ। কিন্তু, 'মোটা ষাটপাউন্ড অ্যান্টিক' কাগজে মুদ্রিত 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্য-পুস্তিকাটির প্রতি সমকালীন পাঠক ও কবিদের অমনোযোগ তাঁকে কিছুটা হতাশ করলেও, তিনি তাঁর লেখার বিষয়ে, নিজেকে ক্রমাগত পরিশীলিত করে তোলার চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন। বরং, কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর বিদেশী কবিতার অনুবাদ মুদ্রিত হতে থাকল, সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকদের আগ্রহে, যা তাঁর কাছে কিছুটা অনভিপ্রেত ছিল। এই সময় 'বক্তব্য' নামের একটি পত্রিকায় আমন্ত্রিত হয়ে কিছু অনুবাদ করে পাঠাতে হয়, যে জন্য কিছুটা বিরক্ত হতেন। কেননা, বাংলা কবিতায় মৌলিকতার আকর্ষণে তখন তিনি নিজের রচনার স্বাতন্ত্র্যে আস্থাশীল। যে জন্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম সূচনাতেই তিনি নিজের কবিতারও নির্মম সমালোচক ছিলেন; পঞ্চাশটি কবিতার মধ্যে মাত্র গোটা পাঁচেক নির্বাচনযোগ্য হয়েছিল মনে প্রথম কাব্য-পুস্তিকার জন্য।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যপুস্তিকা 'গায়ত্রীকে' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। একদিকে, তাঁর প্রণয়-ব্যর্থ উদ্‌ভ্রান্ত জীবন তাঁর নিজের কবিতার ভাষাতে : 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।' অন্যদিকে তাঁর ক্ষণস্থায়ী

চাকরির বিড়ম্বনা, হয়ত বা সবেমাত্র মানসিক পীড়ায় তিনি আক্রান্ত, যে জন্য প্রতিদিনের জীবনযাপন তাঁকে ক্রমাগত এক কিংবদন্তীর পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। নানা ধরনের মুখরোচক গুজবে, তিনি নানা মহলে আলোচ্য হয়ে উঠেছেন। সে সময় কলকাতার কাব্যজগতে পঞ্চাশের কবি হিসাবে সদ্য খ্যাতিমান এমন কয়েকজন, যাঁদের কাব্যচর্চায় ও জীবনযাপনে, নতুন এক ভয়ানক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাঁদের সম্মিলিত কবিসঙ্ঘের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে ঘিরে বাংলা কবিতায় একটা নতুন প্রবাহ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'কৃত্তিবাস'-পন্থীদের নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের যে সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তাঁরা, তাঁদের সাম্প্রতিক রচনাতে তার প্রভাব স্পষ্ট। এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কয়েকজন কবি-গল্পকার, সদ্যসংগঠিত নতুন 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি দলে যোগদান করেন, প্রাথমিক পর্বে এই দলের সাময়িক নেতা হিসাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'গায়ত্রীকে' প্রকাশিত হওয়ার বছর খানেক পরে, হাওড়া থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' পত্রিকায় (১৩৭৯) 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব / হাংরি জেনারেশন' শীর্ষক একটি গদ্য লেখেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এই আলোচনার উত্তরভাগে 'গায়ত্রীকে' কাব্যপুস্তিকাটির সমালোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেকেরই ধারণা, শক্তির এই আলোচনাই বাংলা ভাষায় 'হাংরি আন্দোলনে'র প্রথম আভাস হিসাবে প্রকাশিত। এই একই সংখ্যায় 'সম্প্রতি'তে, 'কী যে হবে কী যে হয়' নামে বিনয়-এর একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়। রহস্যময় ভাষায়, শক্তি এই নতুন হাংরি-আন্দোলনের স্বপক্ষে গদ্যটি লিখেছিলেন, নিজেদেরকে 'ক্ষুধার্ত' পন্থীর প্রবক্তা দেখতে চেয়ে, যেন সেই সূত্রেই বিনয়-এর কাব্যপুস্তিকার আলোচনাটি উপস্থাপিত হয়। শক্তি, তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহারে লিখেছিলেন : 'বিনয়ের পদ্যের যে-পাঠক সে বিনয়ের পদ্য পড়লেই, তার অনুভবক্ষমতা যদি যথাযথ হয়, তবে বিনয়কে অনুভব করবে, বিনয়ের পদ্যের জগৎ বিশেষ ক'রে এ'র পরবর্তী পদ্যগুলি উপরোক্ত গোত্রের আন্দোলনকে অনেক জাগ্রত করে।' এর পরে, এই আন্দোলন একটা তুঙ্গ চেহারা নেয়, হাংরির স্বপক্ষে উদ্যোক্তারা যে সব ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাতে কখনো-কখনো বিনয়-এর নামও সদস্যতালিকাভুক্ত হয়।

'সম্প্রতি' পত্রিকার সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কথা-প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচককে জানিয়েছিলেন, মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত বিনয় স্বয়ং, শক্তির এই আলোচনার প্রতিক্রিয়ায় একটি ক্রুদ্ধ চিঠি লিখেছিলেন সম্পাদককে। তাঁর ধারণা, এই বিশ্বসংসারে শক্তি কেন,—কারো পক্ষেই বিনয়-এর কবিতা বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে পারেন একজনই, যে মানুষীর উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং বিনয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, বিনয়ের পত্রটি যেন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় এবং আলোচ্য সমালোচক এবং সম্পাদক উভয়কেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে 'সম্প্রতি'র মাধ্যমে। নিতান্তই প্রলাপ বলে, কবির সেই চিঠি উপেক্ষা করেছিলেন সম্পাদক, এমনকি দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি

সংরক্ষিত হয়নি তার কারণ বিনয়-এর কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এ চিঠি যে কোনো সময় গুরুত্ব পেতে পারে এমন কথা হয়ত ভাবেননি তিনি। একথা ঠিক, হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিনয় কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেননি, কিংবা তাঁদের কাব্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট কোনো সংযোগ ছিল বলে মনে হয় না। যে জন্য বিনয়-এর রচনায় তার আভাসও পাওয়া যায়নি। তবু একথা সত্যি, 'সম্প্রতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তির 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়' বিনয়-এর কাব্য বিষয়ে সমকালীন পাঠক ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন, অনেকেই তাঁর কবিতা নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশে আগ্রহ পোষণ করেন।

দুই

'গায়ত্রীকে'-র চৌদ্দটি কবিতার সঙ্গে আরো তেষট্টিটি কবিতা যোগ করে উপর্যুক্ত প্রকাশনের তত্ত্বাবধানেই ১৯৬২ সালে পরবর্তী কবিতার বই 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশিত হয়; আবার এই 'ফিরে এসো, চাকা'-রই পরিবর্তিত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে।

এক অর্থে 'ফিরে এসো, চাকা' বিনয়-এর সমগ্র কাব্য জীবনে সম্ভবত সব চেয়ে এবং একমাত্র পরিচিত কাব্যগ্রন্থ। পূর্বোক্ত 'সম্প্রতি' পত্রিকাতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় পুনরায় আর একটি দীর্ঘ আলোচনায়, তাঁর কবিতায় উপমা প্রয়োগের নিজস্বতার কথা উল্লেখ করে লেখেন: "বিশেষতঃ বিনয়ের কবিতার চারিপাশে ও ভিতরে সংগীতময়তা নাই, বদলে এক অসাধারণ চিত্রময়তা বর্তমান। এত অপরিমেয় চিত্রে ব্যস্ত বিনয়ের এই গ্রন্থের কবিতা যে, সময়ে-সময়ে, মনে হয়, একে দুষ্ট ব্যবহার বলি, কিংবা বলি লোভাতুর উন্মাদ এই কবির আশ্চর্য ঐ সবই। ছবির পর ছবি—উপমার পর উপর্যুপরি উপমা বিনয়ের বৈশিষ্ট্য এবং বিনয়ের মধ্যে যে অসামান্য বিষয় আছে তার প্রকাশ। এই প্রাচুর্যময় অস্থিরতার মানে বিনয়ের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় যে পেয়েছে তার কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, বাকি সকলেরই গ্রাহ্যগ্রাহ্যের বাইরে।" আলোচ্য রচনায় শক্তি তাঁর কয়েকজন সমকালীন কবিবন্ধুর প্রসঙ্গ তুলে লিখলেন: 'বিনয়ের কবিতা পাঠ করে আমি সম্পূর্ণ অন্য এক বিপন্ন কবিত্বের আস্বাদ পাই এবং সেখানে তার শেষতম ইচ্ছা 'চিরন্তন শিখরের বায়ু।" উল্লেখ করা যায়, শক্তি তাঁর দীর্ঘ রচনার কোথাও তদানীন্তন নবসংগঠিত হাংরি আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। কিন্তু 'আত্মকথায়' পরবর্তীকালে বিনয় স্মৃতি থেকে জানিয়েছিলেন, 'এই সমালোচনার ফলে হৈ-চৈ পড়ে গেল কলকাতায়।'

এই সময় প্রায় এক বছর বিনয় কবিতা রচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে বিনয় কলকাতায় ফিরে এলে, শক্তি তাঁকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একটি পুরাতন সংখ্যা উপহার দিয়ে লেখার আমন্ত্রণ জানান। যদিও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বিষয়ে তখনো পর্যন্ত বিনয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ বিষয়েও

সে সময় একটা অনিশ্চিত ভাব দেখা দেয়। সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আইওয়া পোয়েট্রি ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত হয়ে তখন বিদেশে, তাঁর অবর্তমানে শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় তখন সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু শরৎ কুমারের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে 'কৃত্তিবাস'-এর অনেকেই সন্তুষ্ট হননি, পারস্পরিক এক বিবাদ ও ভাঙনের আভাস লক্ষ্য করা যায় দলে। কয়েকজন এই সময় 'কৃত্তিবাস' থেকে বেরিয়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। যাই হোক, মূলত শক্তির আহ্বানে, শরৎ কুমার সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অষ্টাদশ সংকলনে 'একটি প্রস্তাব' শীর্ষক কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে বিনয়-এর পুনরাবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী ঊনিশতম সংকলনে তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হলেও, বিংশ সংকলনে তিনি কবি হিসাবে অনুপস্থিত। অন্য দিকে, এই সময় হাংরি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে, 'কৃত্তিবাস'-এ অবশ্যম্ভাবী যে ভাঙন দেখা দেয়, তাতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। হয়ত এই কারণেই, বিনয়-এর পক্ষে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য 'আত্মপরিচয়-'এর বিনয় জানিয়েছিলেন: '১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ঈশ্বরীর' নামক কবিতাগ্রন্থখানি ছাপা হয়ে বেরোয়। এ বইয়ের প্রায় সব কবিতাই আদি রসাত্মক। কিন্তু এই বই পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি। এখন পর্যন্ত একই অবস্থা চলছে। এর পরে বেশ কিছুকাল আমি কবিতা লিখিনি। 'ঈশ্বরীর' বইখানির কবিতাগুলির ছন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্য খুব ভালো—এ কথা আমি তখন বুঝতাম এখনো বুঝতে পারি। আমার কবিতা সম্পর্কে ছোটবড় আলোচনা তখন নানা পত্রিকায় বেরোতে সুরু করে।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস'-এর বিংশ সংকলনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি গদ্য রচনা বিনয়কে অবলম্বন করে লেখেন জ্যোতির্ময় দত্ত। দীর্ঘ সেই নিবন্ধের শিরোনাম 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ।' এই প্রবন্ধটির বিষয়ে বিনয় পরবর্তী কালে স্মৃচিচারণে লিখেছিলেন: '১৯৬৪ সালের গোড়াতেই লক্ষ্য করলাম, আমি কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছি, বিশেষত পত্রিকার সম্পাদক মহলে।' এমনকি 'দেশ', 'অমৃত'-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাতেও তিনি লেখার আমন্ত্রণ পান। প্রায়ই কাব্যপাঠের আসরেও তাঁর যোগদানের আহ্বান আসে। যদিও কলকাতায় খুবই অনির্দিষ্ট জীবনযাপন করছেন তিনি, তাঁর অস্থির মনের কারণে নিত্য নতুন ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন, স্থায়ী ঠিকানার অভাবে প্রায়ই কবি কিংবা কবিতাপ্রেমী পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের সাহচর্যের উপর নির্ভরশীল। এরকম সময়ে তারাপদ রায়ের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হন জ্যোতির্ময় দত্ত-র সঙ্গে। প্রথম সাক্ষাতে জ্যোতির্ময় একটা প্রবন্ধ দেখান, যেটি বিনয়কে অবলম্বন করে রচিত এবং তাঁর অনুমতিক্রমে প্রবন্ধ পাঠের বিষয়ে বিনয় ২১.৩.৬৪ তারিখে লিখিত মন্তব্য করেন: 'এই প্রবন্ধে ব্যক্ত কোনো মন্তব্য, প্রদত্ত কোনো তথ্য, লিখিত কোনো উক্তি—আমার কিছুমাত্র আপত্তিকর বলে মনে হয় না।' রচনাটি 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন জ্যোতির্ময়, কিন্তু দীর্ঘ

হওয়ায় সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাহৃত হয়, বিংশ সংকলনে রচনাটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। হয়ত 'সম্প্রতি' পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সমালোচনায় কবির প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আলোচ্য রচনার পাদটীকায় বিনয়-এর মন্তব্যও প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্ময় তাঁর প্রবন্ধে লিখলেন : 'এরই মধ্যে বিনয় মজুমদার বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত হয়ে গেছে, এবং তার মধ্যে সত্যের অংশ কতটুকু তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট শুধু এইটুকু : বিনয় মজুমদার একজন বেদনার্ত, সত্যদ্রষ্টা কবি, একজন শহিদ যিনি নিজের সবটুকু কবিতায় নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন, এবং যাঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি, বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।' এই বর্ণনায় তিরিশের আর এক কবির ছবি যেন ভেসে ওঠে, হেমচন্দ্র বাগচী যাঁর কবিবন্ধু'ধ বন্ধু সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় অনেকটা স্থান অবারিত রেখেছিলেন। মস্তিষ্কপীড়ায় মাঝে মাঝে দীর্ণ হয়েছেন হেমচন্দ্র, অধুনা-বিস্মৃত সেই কবির কথা বুদ্ধদেব আজীবন স্মরণে রেখেছিলেন। জ্যোতির্ময় তাঁর নিবন্ধে বিনয়-এর হতাশ প্রেম, তাঁর আচিকিৎস্য ব্যাধি তাঁর সাংসারিক ব্যর্থতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিস্তারিত বলেননি, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, বার বার বাধাপ্রাপ্ত জীবিকার অসঙ্গতি, কাব্যচর্চার সমান্তরাল তাঁর গণিতচর্চা, নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে তিনি যে বারংবার প্রহৃত হয়েছেন কেবল এইসব সহমর্মিতাপূর্ণ সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু বিস্তৃত অংশ জুড়ে উদাহরণময় বিনয়-এর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা মনে হতে পারে পক্ষপাত-পূর্ণ, কিন্তু খুবই হৃদয়স্পর্শী রচনা। জীবনানন্দকে অবলম্বন করে যেভাবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর দীর্ঘ কাব্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, অনেকটা সেই রকম। দীর্ঘ সেই প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে বিনয়-এর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে এসো, চাকা'-কে অবলম্বন করে, যা তখনও পর্যন্ত প্রকাশকের কাছে একটিও অবশিষ্ট নেই, 'কিন্তু পাদটীকায় লেখক উল্লেখ করেছেন : 'আমার ঈশ্বরীকে নামে নতুন সংস্করণে গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একুশতম সংকলনে 'এই সংখ্যার লেখক' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত বিভাগে বিনয় মজুমদার বিষয়ে জানানো হয় : 'বাংলা দেশে একমাত্র কবি যিনি নিজের ইচ্ছেমত জীবন কাটাচ্ছেন। ওঁর ১৪৩টি কবিতা, সমগ্র কবিতা-সংগ্রহ হিসেবে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' নামে সুদৃশ্য বাঁশপাতা কাগজে ছাপা, শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।'

'ফিরে এসো, চাকা'-র রচনাকাল মার্চ ১৯৬০ থেকে জুন ১৯৬২, জ্যোতির্ময়-এর ভাষায় : 'যতদিন কবিতা লিখেছেন তিনি আর প্রায় কিছুই করেননি, নিজের প্রতিটি কণা সঁপে দিয়েছেন কবিতায়, যেন এই বিকারের ঘোরে কাটিয়ে দিয়েছেন সফল দুই বছর, পরে কবিতা লেখা ত্যাগ করে, চলে গেছেন বিপরীত মেরুতে, ব্যাপৃত হয়েছেন গণিতের চর্চায়। র‍্যাঁবো কবিতা বর্জন করে চলে গিয়েছেন আফ্রিকায়; বিনয় মজুমদার ভৌগোলিক ভাবে যদিও দূরে যান নি, মানসিকভাবে তিনি আরো অনেক বেশী দূরে চলে গেছেন, এখন

তাঁর কবিতার নিন্দা তাঁকে পীড়িত করে না, প্রশংসা দেয় না আনন্দ, এমন কি কোনো লম্পট পিতার মতো, তিনি তাঁর কবিতার জনকত্ব পর্যন্ত মাঝে মাঝে অস্বীকার করেন।'

উপর্যুক্ত প্রবন্ধটির রচনাকালের সময়সীমায় দীর্ঘ ছ'মাস বিনয় মানসিক চিকিৎসালয়ে ছিলেন, যখন একটিও কবিতা লেখেননি তিনি। কিন্তু হাসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, পুনরায় তাঁর কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত লেখন-স্রোত লক্ষ্য করা যায় যে জন্য মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অর্ধ শতাধিক কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। 'আমাদের কাছে বিনয় মজুমদার এক রহস্য। এবং উন্মোচন।' জ্যোতির্ময় তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাবে লিখলেন: 'বর্তমান প্রবন্ধ লেখক স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজে আধুনিক সমালোচনার বুলি ও নানান মতের কুহকে বন্দী ছিলেন, তাঁর কাছে বিনয় মজুমদার কবিতার জাদু-রহস্য উন্মোচিত করেছেন। গত একশো বছরে বাংলা কবিতা বড়ো বিদগ্ধ, আত্মসচেতন, জটিল হয়ে উঠেছিল। কবিরাও বড় বেশি শিক্ষিত, সুরুচি-সম্পন্ন, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হয়ে যাচ্ছিলেন। এই চাতুর্যহীন, সরল, অভিযোগহীন কবিটি, এই অনায়াস বিদ্রোহীটি শুধু কবিতার প্রতি নয়, কবিত্বের প্রতি আমার আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আজ অসুস্থ এবং অবলম্বনহীন উনত্রিশ বছর বয়সেই তিনি জীবন থেকে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন। জানি না এই প্রবন্ধ তাঁকে নতুন কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ, কিংবা অন্য কোনো পাঠককে তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করবে কিনা। না করুক। তাঁর কবিতার জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আমার উপায় ছিল না।' 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় একুশতম সংকলনে 'এই সংখ্যার লেখক' শিরোনামে জ্যোতির্ময় দত্ত-র পরিচিতি দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হল: 'বিনয় মজুমদার সম্পর্কে কৃত্তিবাসের গত সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ আধুনিক সমালোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত।'

ক্রমান্বয়ে বিনয় শুধু বাঙালি পাঠক বা কবিমহলে নয়, ভারতীয় অন্য ভাষাতেও, বিশেষত হিন্দি ভাষার কবিমহলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেন। হিন্দি একটি পত্রিকায়, তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশ হয়, এবং তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেও তাঁকে অভিহিত করা হয়। বিখ্যাত বঙ্গভাষা প্রেমিক এডওয়ার্ড ডিমক-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, এই পর্বে'ই।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার তেইশতম সংকলনে (শরৎকাল ১৩৭৩) বিনয় মজুমদারের প্রাধান্য পুনরায় লক্ষিত হয়। 'দশটি কবিতা' শিরোনামে বিনয়-এর শিরোনামহীন একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়। আলোচ্য সংকলনটিতে 'কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি: তাঁদের কবিতা' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়, যাতে আলোচিত হন পঞ্চাশের পাঁচজন কবি 'জন্ম-সালের বিচারে যাঁরা ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ এর অন্তর্গত, আর কবি হিসাবে যাঁদের আবির্ভাব পঞ্চাশের পরে বা ওই সময়কে ছুঁয়ে।' এই আলোচনায় যথাক্রমে আলোক সরকার, বিনয় মজুমদার, শরৎ-কুমার মুখোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলোচিত হলেন। উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করে, প্রবন্ধকার জ্যোতির্ময় ঘোষ বিনয়-এর কবিতায় 'চকিত চিত্র' ও উপমাবহুল 'বিশেষ

সম্পদ'-এর কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর কবিতার প্রকরণ বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে লিখলেন : 'জীবনানন্দের শব্দভাণ্ডার ও সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস কোনো অভিনব রসায়নাগারে জৈবিক প্রথায় মিলিয়ে দিলে বিনয়ের কবিতার কাছাকাছি পৌঁছায়।' জ্যোতির্ময় বিনয়-প্রাসঙ্গিক অংশের উপসংহারে জানালেন : 'বিনয়ের কবিতাগুচ্ছ স্পষ্টত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম দিকে কবি বিষণ্ণ, মিতবাক্, লাঞ্ছিত, নম্র, অবসন্ন ; তখন জীবনানন্দীয় ভঙ্গীটা চলে আসে। বিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছি—একটিমাত্র অভিজ্ঞতাও যদি কবির স্বোপার্জিত ও গভীরতালব্ধ হয়, তাহলেও আমরা কিছু সৎ ও সার্থক কবিতার আশা করতে পারি—বস্তুত বিনয়ের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। শুধু আঙ্গিকে বিষাদ-বিনতির স্বাধর্ম্যসূত্রে জীবনানন্দের শব্দাবলী অনিবার্যত এসেছে, আর শেষ পর্যায়ে কবিতায় যখন শাস্ত্র, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত নির্মাণে তৎপর হ'য়ে উঠেছেন, তখন সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস তাঁকে আহ্বান ক'রেছে। তবু, যে-বিশেষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষণী সুদূরে ছিলো না, সেখানে অগ্রজ কবির অনুপ্রবেশ তাঁর আত্মমগ্ন বেপরোয়া নিশ্চেষ্ট কবি স্বভাবের স্মারক হ'য়ে অন্যান্য সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের বিপদসঙ্কেত দ্যোতক হয়ে থাকল।'

তিন

দেখা যায়, বিনয় মজুমদার, তাঁর কাব্যচর্চায় কখনো সম্পূর্ণ নীরব আবার কখনো যেন তাঁর সৃষ্টির অবাধ উৎসারণে অধিকমাত্রায় বাঙ্ময়। ভাবা যায় না, 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা' নামে তার ছয়ভাগে বিভক্ত কাব্যমালা রচনা করতে মাত্র একমাস সময় লেগেছিল। সেগুলি সংখ্যানুক্রমিক পর্বে বিভক্ত, যথাক্রমে 'অনুভব', 'এক্ষণ', 'কৃত্তিবাস' 'দৈনিক কবিতা' এবং 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শেষোক্ত পত্রিকাটিতে বিলম্বিত তৃতীয় পর্বটি মুদ্রিত হয় ; 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় পরপর দুটি সংখ্যায় স্থান পায় চতুর্থ এবং পঞ্চম ভাগ। ১৯৭০ সালে মুদ্রিত একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় জানিয়েছিলেন, 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা-র' তাঁর স্বরচিত প্রিয় কবিতা। 'ফিরে এসো, চাকা'-র পর 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা' কাব্যগুচ্ছ শুধু নতুন স্বাদের নয়, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে বিনয়-এর অবস্থানে নতুন মাত্রা সংযোজনের সহায়ক হয়েছিল। বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ লিখেছিলেন : 'এর পরে কবিতা লেখার গতি খুব মন্দ হয়ে আসে। ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ এই তিন বছরে আমি গোটা পঁচিশেক কবিতা লিখেছি। তাও আবার খুব ছোট আকারের।'

১৯৬৬ সালের পরবর্তী সময় থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কবিতা-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ; কখনো দেখা যায় পুরনো পত্রিকাগুলি একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো কাব্যক্ষেত্রে চাঞ্চল্য জাগিয়ে কবিতা নিয়ে তোলপাড় করে প্রকাশিত হচ্ছে একটার পর একটা নতুন পত্রিকা। এই সব নব প্রকাশিত পত্রিকায় বিনয় কখনো উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে উপস্থিত, আবার

কথনো তাঁর কাব্যানুসরণে অন্য কেউ রচনা করছেন কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ। বিনয় 'আত্মপরিচয়'-এ জানিয়েছিলেন : 'ইতিমধ্যে বাংলা কবিতা পত্রিকার রাজ্যে দারুণ ওলট পালট হয়ে গেছে ; কৃত্তিবাস, অনুভব, উত্তরঙ্গ, প্রভৃতি ছোট পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ সকলে দল বেঁধে দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা, প্রভৃতি প্রকাশ করতে লেগে গেছে। শক্তি নিজে সাপ্তাহিক কবিতার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছে। সারস্বত নামে একটি পত্রিকা দিলীপ গুপ্তের সম্পাদনায় বেরিয়ে আবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গল্প কবিতা, কলকাতা প্রভৃতি নতুন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল। আমাকে এইসব উদ্যমে কেউ ডাকে নি, আর আমার নিজের যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' এতথা ঠিক, বিনয়-এর এই স্মৃতিচর্চায় সবকটি তথ্যই নির্ভুল বা সঠিক নয়, উপর্যুক্ত পত্রিকার অনেকগুলিতেই তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে, বরং কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর প্রাধান্যও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বরং এই পর্বে গদ্যকার বা প্রবন্ধকার বিনয় মজুমদার-এর পরিচয় পাঠকমহলে কিছুটা নতুন স্বাদ বয়ে আনে। 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' নামে 'কলকাতা' পত্রিকায় তাঁর একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, কাব্যরস বা কবিতার রস বিষয়ে তাঁর স্বভাবগম্ভীর রচনাটি সুখপাঠ্য নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্বতামণ্ডিত এক রহস্যময় ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর আবির্ভাব তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বাইশতম সংকলনে (১৯৬৬) বিনয় 'এইসব সত্য' শীর্ষক একটি গদ্য রচনায় নিজের কবিতায় বারবার ফিরে আসা এক ঈশ্বরীর অনুভূতির স্বপক্ষে কিংবা তাঁর নিজেরই দ্বৈতসত্তার এক নিবিড় পরিচয় উদ্ঘাটন করে লিখেছিলেন : 'কারো সঙ্গে কথা না বলে শুধু আপন মনে বাস করা। এমন মানসিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করা, যার ফলে একাকিত্ববোধ আর থাকে না। আমি অবশ্য নিজেই ঈশ্বরীরূপে আমার কানের কাছে চিরকাল কথা বলি এবং মুখ দিয়ে ঈশ্বররূপে তার জবাব দিই। এইভাবে আমাদের বাক্যালাপ চলে। ভালোবাসাবাসি চলে।'

তাছাড়াও উপর্যুক্ত তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার কথা উল্লেখ করেননি বিনয়, 'কবিতা পরিচয়' নামে সেই নতুন ধরনের পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল, জ্যোতির্ময় দত্ত রচিত বিনয়-এর দুটি কবিতার বিষয়ে আলোচনা। প্রথমটি প্রকৃতপক্ষে পুনর্মুদ্রণ, বিংশ সংকলনে 'বিনয় মজুমদার কবিতার শহিদ' শীর্ষক দীর্ঘ রচনার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ ; দ্বিতীয়টির শিরোনাম : 'একটি উজ্জ্বল মাছ : বিনয় মজুমদার'—যেখানে জ্যোতির্ময় লিখেছিলেন : 'ফিরে এসো, চাকা'-র মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিবর্তন আছে, কিন্তু প্রকরণের নেই ; এই চক্রের প্রথম থেকেই বিনয় মজুমদার এক পরিণত কবি। তিনি ধীরে ধীরে এখানে পৌঁছানি, যেন মুহূর্তেই আবির্ভূত হলেন, এক নতুন চেতনার জন্মের তারিখ সচরাচর উল্লেখ করা যায় না, এমন কি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গর আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ বদলেছেন। কিন্তু ,ফিরে এসো, চাকা'র কবি পূর্বপরহীন। ১৯৬০-এর ৩রা মার্চ বিনয় মজুমদার একটি

নতুন চেতনার জন্ম দিলেন, একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কল্পলোক, যেন সম্পূর্ণ ইতিহাসমুক্ত, যার গর্ভ ও শৈশবের মলিনতা নেই।' এই 'কবিতা পরিচয়' মাসিক পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় আধুনিক বাংলা কবিতার এক তন্নিষ্ঠ আলোচক হিসাবেও বিনয়-এর অন্যতর পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। জীবনানন্দর সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে তখন তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা হতে থাকে বিভিন্ন আলোচনায়, সেদিক থেকে জীবনানন্দর কবিতার এক আগ্রহী পাঠকের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় 'অদ্ভুত আঁধার এক' শীর্ষক আলোচনায়। শুধু জীবনানন্দ নয়, এই একই পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ-এর 'নন্টনীড়' কবিতা বিষয়ে দীপ্তি ত্রিপাঠীর আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করেন বিনয়। এইসব রচনার সূত্রে বিনয়-এর এক মগ্ন এবং স্পষ্ট পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, নিজের সমকাল কিংবা সদ্য যে কাল অতিক্রম করে এসেছেন তাঁরা, সেই উভয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না তিনি।

ষষ্ঠ দশকের শেষ পর্যায়ে বিনয় মজুমদার, বাংলা কাব্যজগতে হয়ত জনপ্রিয় কবি হিসাবে বিবেচিত হননি, কিন্তু তাঁর বিশেষ মেজাজের কবিতা বাঙালি পাঠক উপেক্ষাও করেননি। উল্লেখ করা যায়, 'বিশ্বে প্রথম' এই দাবি নিয়ে 'দৈনিক কবিতা' (১৯৭০) পত্রিকার পক্ষ থেকে পল্লব সেনগুপ্তর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এক অদ্ভুত কবি-সমীক্ষার আয়োজন হয়েছিল—জনপ্রিয়তার ক্রমানুসারে বিনয় মজুমদারও সেই তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন দশ-বারো জনের মধ্যেই। পঞ্চাশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের একত্রিত করে 'এই দশকের কবিতা' (১৯৬৯) সংকলনটি শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদনা করেন পঞ্চাশের কবিদের নিয়ে 'একালের প্রেমের কবিতা' (১৯৬৯) নামের একটি সংগ্রহের ; এই সময় শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' (১৯৭০), অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'কবিতার পুরুষ'-ও (১৯৭০) প্রকাশিত হয়—এই সব কটি সংকলনেই বিনয় মজুমদার গৃহীত হয়েছেন সসম্মানে। লক্ষ্য করার বিষয় নিজের সংকলনের কবিতা নির্বাচনে যেমন তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন, তেমন অন্যের সম্পাদনায় তাঁর কবিতার সংযুক্তির বিষয়েও সব সময় উদাসীন ছিলেন না। যে জন্য 'কবিতার পুরুষ' কিংবা 'স্বনির্বাচিত' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর কবিতার সার্থক প্রতিনিধিত্ব ছিল না বলে পরবর্তীকালে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার তাঁর কাব্যজীবনে এক বিশেষ মর্যাদাকর ঘটনা—বুদ্ধদেব বসু, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের পঞ্চম সংস্করণে (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) বিনয়-এর কবিতা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

'প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে মুগ্ধ করেছিল'—এই প্রশ্নের জবাবে এক মুদ্রিত সাক্ষাৎকারে বিনয় জানিয়েছিলেন : 'না', কারো দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। আসলে বিনয়কে নিয়ে কখনো-সখনো কোনো দল হুজুগে মাতলেও, কোনো বিশেষ দলের ভাবনা-চিন্তা দ্বারা কখনো আন্দোলিত হননি তিনি। সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার বৃত্তে তাঁর সঞ্চরণ, হয়ত, একাকিত্বের এই পথ-পরিক্রমায় ক্লান্তি

নেমেছে, থেমে গিয়েছেন মাঝে-মাঝে, শারীরিক অসুস্থতা কিংবা নতুন পথের সন্ধানের কারণে। কিন্তু সেসব ঘটেছে তাঁর নিজের স্বভাব-মন্থরতার অনুসরণে। বিনয় তাঁর 'আত্ম-পরিচয়'-এ এই বিরতির প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছিলেন : 'মাঝে মাঝে কবিতা লেখা যে বন্ধ থাকত তার প্রধান কারণ ছিল বিষয়বস্তুর অভাব। বিষয়বস্তু খুঁজে পেতাম না আমি। চারিপাশে যে সকল দৃশ্য দেখি, আমরা সকলেই দেখি, তার হুবহু বর্ণনা লিখলে কবিতা হয় না। সেই দৃশ্য আদৌ কেন আছে, কী কারণে বিশ্বে তার থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশ্বে নামাবলী ও গঠনপ্রকৃতি ঐ দৃশ্যে কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে—এই সব বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করে না দিলে আধুনিক কবিতা হয় না। কিন্তু যুক্ত করতে হলে ঐ সব জানা দরকার। এই সব দার্শনিক বিষয় ভাবতে ভাবতে আমার সময় চলে যেত মাসের পর মাস।' এরকম, এক দীর্ঘ নীরবতার পর বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'উত্তরণ' পত্রিকায় তাঁর 'অধিকন্তু' পর্যায়ের কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন সম্পাদকের উপর্যুপরি অনুরোধের সূত্রে। এ জন্য আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় তাঁর দলছুট-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতা ছাড়া সবকিছুর প্রতি উপেক্ষার এক অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী আচরণে তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই নতুন। সত্তরের দশকে রাজনৈতিক কারণে যখন পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, তখন 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোগে এক মুদ্রিত সাক্ষাৎকারের উপলক্ষে প্রবীণ ও নবীনের মেলায় বিনয়ও সামিল হয়েছিলেন কিন্তু তখনকার 'তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তাঁর সামাজিক অস্থিরতা' তাঁকে লেখার সময় সচেতনভাবে প্রভাবিত করে না, একথা বলতে তার কোনো দ্বিধা হয়নি। আসলে কবিতার চেয়ে কোনো কিছু বড় করে দেখেননি বিনয়, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও। এক অর্থে কবিতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত। জীবন ও কাব্যাত্মার পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অলীক যাত্রায়, তাঁর কবিতা তাঁর আত্মজীবনেরই এক অনবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তাই দেখা যায়, মানসিক অসুস্থতায় যখন তিনি হাসপাতালে, তখনো সাহিত্য ছাড়তে পারেননি, হাসপাতালের ভিতরে হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, এক সময় গোবরা মানসিক হাসপাতালে কিছুকাল সহবাসী ঋত্বিক ঘটক-এর মতো বিরল প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটেছিল তাঁর। এমনও হয়েছে, ঋত্বিক রচিত নাটকে অন্যতম অভিনেতা হিসাবেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

ষাটের শেষের কয়েকটি বছর বিনয়-এর অসুস্থতা ক্রমশ খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে, তিলজলায় গোবরা মানসিক হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়; একবার এই অসুস্থ শরীরে তিনি পায়ে হেঁটে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে ফরিদপুরে এক মুসলমান পরিবারে আশ্রিত হন। তারপর, স্বেচ্ছায় সে দেশের পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে সে দেশের নাগরিকতা পাওয়ার প্রত্যাশা জানান, অবশেষে তাঁদেরই সহযোগিতায় পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি এরকম অবস্থাতেও, কবিতার কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি।

সত্তরের শুরুতে 'ফিরে এসো, চাকা'-র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সুদৃশ্য

সেই শোভন সংস্করণের লেখক পরিচিতিতে জানানো হয় : 'এখন তিনি নিয়মিত কর্ম করেন না। ঠিকানা : কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা।' 'দেশ' পত্রিকায় 'একটি অসাধারণ কবিতার বই' শিরোনামে, বিনয় বিষয়ে কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য পরিবেশন করে সনাতন পাঠক লিখেছিলেন : 'এই কবিতার আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কবিতাগুলি এক নজরে পড়লেই বোঝা যায়, দুর্লভ এক কবির হৃদয় বা মস্তিষ্ক এগুলি রচনা করেছে। এই কবিতা চৈতন্যের অনেক ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই কবিতা উপভোগ করার, আলোচনা করার নয়।' এই আলোচনায় অন্যত্র সনাতন পাঠক লিখেছেন : 'বিনয় মজুমদারের মতো কবি পৃথিবীর যে কোনো দেশেই দুর্লভ। বাংলাদেশ কবিতার দেশ—এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা, যদি সত্যি তাই হতো তাহলে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। অবশ্য মাথায় করে রাখলেই যে তিনি থাকতেন তা মনে হয় না, ওই রকম কুস্থান তিনি আঁচরেই পরিহার করতেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা।'

একথা ঠিক, দ্বিতীয় বার 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশে বিনয় মজুমদার-এর কবি-খ্যাতি আধুনিক কাব্যপাঠক মহলে নতুন মাত্রা পায়। ১৯৭০ সালে 'কলকাতা' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হয় : '...বর্তমান কলকাতা সংস্করণ এই গুপ্ত ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'ফিরে এসে, চাকা' কেবল কোন ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর গোপন সম্পদ নয়, তা বাংলা কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। 'ফিরে এসো, চাকা' ধূসর পাণ্ডুলিপি কি 'অর্কেস্ট্রা'র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।'*

একেবারে সূচনা থেকেই বিনয় মজুমদার নিজের কবিতার পরিমণ্ডল নিজেই গড়েছেন। কোনো অনুসরণ, কোনো অনুকরণ, কোনো পৃষ্ঠপোষকতার সুচারু পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয়নি। শোনা যায়, এক সময় নিজের কাব্য-পুস্তিকা, নিজেই ছেপেছেন, নিজেই কম্পোজ করেছেন, আবার নিজেই বই-হাটে রেখে এসেছেন, যদি বিক্রি হয় এই ভরসায়। এইভাবে সম্পূর্ণ নিজের পথেই তাঁর পরিভ্রমণ—চলার পথে নিছকই চলার শর্তেই কোনো দলে কিংবা সম্প্রদায়ে একত্রিত হয়েছেন, কিন্তু ক্ষণিকের সেই সম্মেলন শুধু বহিরঙ্গে। ছয়ের থেকে প্রতিটি দশকেই তাঁকে দেখতে পেয়েছি, তাঁকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই সরব গুণকীর্তনের আয়োজন হয়েছে—পত্রিকায়, কাব্যসভায় কিংবা সম্বর্ধনায় ; 'সীমান্ত সাহিত্য', 'ত্বষ্টা', 'কবিতীর্থ', 'পণ', 'নৌকো', 'মেঘদূত' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-পত্রিকায় তাঁকে অবলম্বন করে নানাভাবে মূল্যায়নের চেষ্টাও হয়েছে। এমনকি, 'বিনয় পরিমণ্ডল' নামে একটি সংগঠন বা পত্রিকা প্রকাশ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে, হরত ঠাকুরনগর বা শিমুলপুরের সংলগ্ন কোনো গ্রামে। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে, বিনয় মজুমদার যখন

*বিজ্ঞাপনটির উল্লেখ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধেও আছে। সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য পৃ. ১২০ দ্রষ্টব্য।

সম্বর্ধিত হয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে, তখন তাঁর 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সেই কেন্দ্রের দশম বর্ষপূর্তিতে। তা সত্ত্বেও আমাদের স্মৃতি-বিস্মৃতির নানা ধাপ পেরিয়ে বিনয় তাঁর কবিতার রূপে রূপান্তরে ক্রম-অগ্রসরমান এক উদাসীন পথিক, এখনো পর্যন্ত তিনিই তাঁর কবিতার প্রধান পরিবেশক, অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং প্রকৃত সমালোচক। এক অর্থে বিনয় মজুমদার গত তিরিশ বছরের বাংলা কবিতায় এক একাকী পুরুষ : একটি নিঃসঙ্গ উদাহরণ। □